খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ২৫শে জুলাই ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

রমযানের শেষ দশ দিন বা শেষ দশক খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছে। এই দশকে মুসলমানদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দু'টো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ থাকে বা সেগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এগুলোর একটি হলো, লায়লাতুল ক্বদর আর অপরটি হল জুমাতুল বিদা বা রমাযানের শেষ জুমা। এগুলোর একটি অর্থাৎ লায়লাতুল ক্বদর সত্যিকার অর্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকেও প্রমানিত। হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বরাতে উল্লেখ রয়েছে, একইভাবে কুরআন শরীফেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জুমাতুল বিদাকে স্বয়ং মুসলমানরা বা আলেমদের নিজেদের প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা এটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। আজ আমি এ দু'টো কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করব বা এর গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। আজও আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদের খুতবার উপর কিছুটা নির্ভর করব, এ বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য। লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন, কেউ বলেছেন একুশ রমযান, কেউ তেইশ বা ঊনত্রিশ তারিখের রাত সন্ধান কর, রমযানের শেষ দশ রাতে। লায়লাতুল ক্বদর এমন একটি রাত যার একটি বাস্তবতা রয়েছে, আর এটিও বাস্তব সত্য কথা যে, মহানবী (সা.) কে এ বিশেষ রাতের সুনির্দিষ্ট জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, যে রাতে প্রকৃত মুমিনকে দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে দৃশ্য দেখানো হয় আর সচরাচর দোয়া গৃহীত হয়। কিন্তু হাদীস থেকে আমরা জানি, দু'জন মুসলমানের ভুলের কারণে নির্দিষ্ট তারিখ তিনি (সা.) ভুলেগেছেন। এই বিশেষ মুহূর্তের বা সময়ের জ্ঞান অর্জন বা এ সম্পর্কে অবহিত থাকা কোন সামান্য বিষয় নয়। মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে সহজাত ভাবে এ বাসনা জাগ্রত হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা আমি মুমিনদের জামাতকে অবহিত করব। হাদীসে আছে যখন হুযূর (সা.) কে এ জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তিনি সানন্দে ঘর থেকে বাইরে আসেন, মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে, যেন তারাও এটি থেকে লাভবান হতে পারে, কিন্তু বাইরে আসার পর তিনি দেখেন যে, দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছে, তাদের বিতন্ডা এবং মতভেদ দূর করার চেষ্টায় তিনি রত হন, যারফলে তাঁর দৃষ্টি অন্যত্র সরে যায়। মনে হয়, মহানবী (সা.)-এর দীর্ঘ সময় লেগেছে এই দুই ব্যক্তির মীমাংসা করাতে বা এ বিষয়ের সমাধানে দীর্ঘ সময় লেগে থাকবে। যাইহোক, পুনরায় যখন এদিকে মনোসংযোগের চেষ্টা করেন যে, আমি তো লায়লাতুল ক্বদরের নির্দিষ্ট দিন সম্পর্কে অবহিত করতে এসেছি। কিন্তু ততক্ষণে তিনি সেই নির্দিষ্ট তারিখ ভুলে যান, বরং হাদীসে ভুলিয়ে দেয়া শব্দ এসেছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন, হাদীসের শব্দ থেকে প্রতিভাত হয় যে, তিনি ভুলেন নি বরং ঐশী পরিকল্পনার অধীনে সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তে স্মৃতি মুছে দেয়া হয়েছে, তার স্মৃতিপট হতে। যাইহোক তিনি (সা.) বলেন যে, এই বিতন্ড এবং এই বত্সার কারণে, এই মতভেদের কারণে এই মুহূর্তের জ্ঞান প্রত্যাহার করা হয়েছে, তাই তখন সুনির্দিষ্ট রাতের না হলেও একে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে সন্ধান কর। এর মাধ্যমে হযতর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণনা করেছেন। সেই মুহূর্ত যার গুরুত্বের নিরিখে এটিকে লায়লাতুল ক্বদর বলা হয়েছে, তা জাতিগত ঐক্য এবং সংহতির সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা। আমার হাদীস শুনে বলি যে, যদি দু'জন মুসলমানের বত্সা বা বিতন্ডা না হতো, এই নির্দিষ্ট দিন আমরা জানতে পারতাম, কিন্তু এই গুরত্বপূর্ণ কথার দিকে গুরুত মনোযোগ খুব কমই নিবদ্ধ হয় যে, সেই নির্দিষ্ট মুহূর্ত যার গুরুত্বের দৃষ্টিকোন থেকে সেটিকে লায়লাতুল ক্বাদার বলা হয়, তা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে জাতির ঐক্য ও সংহতি হারিয়ে যায়, তাদের জীবন থেকে লায়লাতুল ক্বদরও প্রত্যাহার করা হয়। আজ একান্ত আক্ষেপের সাথে আমাদেরকে এ কথাও বলতে হয় যে, অনেক মুসলমান দেশের দুর্ভাগ্য, তাদের মাঝে সেই ঐক্য নেই, সেই একতা নেই। প্রজা প্রজার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, প্রজা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সরকার জন-সাধারণের উপর অত্যচার করছে এককথায় শুধু ঐক্য এবং সংহতি হারিয়ে যায় নি, বরং যুলুম এবং অত্যচারও চলছে এবং অত্যারের উপর, যুলুমের উপর জোরও দেয়া হচ্ছে। এই ঐক্য এবং সংহতির ঘাটতির ফলেই আজ ভিন-জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে-তাই করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। আর এ কারণেই ইসারাঈলও নির্দয়ভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপুর্যপুরী হত্যা করে চলেছে। যদি মুসলমানদের ভিতর ঐক্য থাকত, সংহতি থাকত, খোদার বর্ণিত পথে চলত তাহলে মুসলমান দেশগুলোর এত শক্তি রয়েছে, এত বড় শক্তি তারা যে, এভাবে যুলুম করা তাদের জন্য সম্ভব হত না। যুদ্ধেরও কিছু নীতি আছে। ইসরাঈলীদের মুকাবেলায় ফিলিস্তিনীদের শক্তি নাই বললেই চলে, যদি এটি বলা হয় যে, হামাসও অন্যয় করছে বা যুলুম করছে, তবে মুসলমান দেশগুলোর উচিত তাদেরকে বাধা দেয়া, কিন্তু উভয় পক্ষের যুলুম অত্যাচারের তুলনা এভাবে করা যায় যে, এক ব্যক্তি লাঠি অন্যায়ের জন্য

ব্যবহার করছে, লাঠি চালাচ্ছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কামান চলাচ্ছে মুসলমান দেশগুলোর প্রতি শোক প্রকাশ করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। সম্প্রতি তুর্কীতে শোক পালন করা হয়েছে। একইভাবে পাশ্চাত্য নিজেদের ভূমিকা পালন করছে না। তাদের উচিত ছিল উভয় পক্ষকে কঠোরভাবে বারণ করা। যাইহোক আমরা কেবল দোয়া করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা নিরীহ জাতিকে অত্যাচারী জাতি হতে রক্ষা করুন। তাদে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুন। অনুরূপভাবে মুসলমান দেশগুলোর ওপর অত্যাচার দিন দিন বাড়ছে, নৈরাজ্য দিন দিন বাড়ছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও বিবেক বুদ্ধি দিন। কলেমা পাঠকারী একজন আরেকজনের হাত যেভাবে রঞ্জিত করছে তা যেন তারা এড়িয়ে চলতে পারে। তাদের নিজেদের মাঝে ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠিত হোক। এছাড়া প্রকৃত অর্থে ইবাদত হতে পারে না এবং লাইলাতুল ক্বদর দেখার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হতে পারে না। কেননা জাতির মাঝে যদি ঐক্য না থাকে, সংহতি হারিয়ে যায় তাহলে লাইলাতুল ক্বদরও উঠিয়ে নেয়া হয়। কেবল রাত এবং অমানিশাই তাদের অদৃষ্ট হয়ে যায় উন্নতির চাকা থেমে যায়। লাইলাতুল ক্বদর হল, সেই রাত যে রাতে তার ভাগ্য লেখা হবে পরবর্তী বছরে সে কতটা উন্নতি করবে, কতটা অগ্রসর হবে, কতটা কল্যাণরাজী সে লাভ করবে এবং কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। মানুষের উন্নতি লাইল বা অমানিশার মধ্যে হয়ে থাকে অন্য দিকে দৈহিক উন্নতির সাথে তুলনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বিষয়টি এভাবে বর্ণণা করেছেন–কুরআন করীম থেকে জানা যায মানুষের দৈহিক উন্নতিও অন্ধকারের মাঝেই লাভ করে। মাতৃগর্ভ যেখানে একটি বাচ্চা লালিত পালিত হয় তা-ও একটি অমানিশার সমাহার। আর সেখানেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। গর্ভকালে যদি সঠিক লালন-পালন না হয তবে ভ্রুন দুর্বল হয়ে যায়। এটি প্রমাণিত সত্য যে মায়ের বাহ্যিক প্রভাব ভ্রুনের ওপর পড়ে থাকে একই খাবারের প্রভাব ভ্রুনের ওপর পড়ে থাকে। বাচ্চার নৈতিক চরিত্র ভাল হবে না যদি মায়ের পবিেশ ভাল না হয়। ভীতু মায়ের সন্তানরা বড় কোন কাজ করতে পারে না। অনেক সময় বইরের কোন ভয়ের প্রভাবে বাচ্চা দুর্বল হয়ে জন্ম নেয়। মায়ের ভাল পরিবেশের প্রভাব বাচ্চার ওপর পড়তে থাকে। আর একারণেই ইসলামী শরীয়তে অন্ত:সত্তা অবস্থায় রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ এতে করে ভ্রুনের ওপর প্রভাব পড়ে। একারণেই শরীয়তত এ সময়ে তালাক দিতেও নিষেধ করেছে। কেননা যে মানসিক আঘাত মায়ের ওপর আসে তাতে করে বাচ্চা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এজন্য মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি খোদার যত বেশি প্রিয় হবে সে তত বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তাই আমাদেরকেও স্মরণ রাখতে হবে আমরাও কোন কোন স্থানে পরীক্ষার সম্মুখীন হবো। এটিই তো লাইলাতুল ক্বদর। এই পরীক্ষার কারণে সে একাগ্রতার সাথে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করে। দোয়ার প্রতিও সে মনযোগ দেয়। খোদার দিকেও তখনই ঝুঁকে যকন সে কষ্টে পিনতিত হয়। যার মাধ্যমে মানুষ কষ্টের যুগকে বা তরবীয়তের যুগকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঐক্যের মানকে নষ্ট করি তবে সত্যিকার অর্থে আমরা লাইলাতুল ক্বদর থেকে লাভবান হতে পারবো না। খোদার সন্তুষ্টি লাভের আশায যদি আমরা কুরবানী করি এবং অব্যাহত রাখি তাহলে আমরা সফল হবো। একটা নতুন জীবন লাভ করবো আমরা। একটা নতুন আঙ্গিকে আমাদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। পারস্পরিক ঐক্য এবং সম্পর্ককে যদি আমরা খোদার সন্তুষ্টির জন্য অটুট এবং অক্ষুন্ন রাখি তবে নতুন নতুন মাইল ফলক আমরা অতিক্রম করতে পারবো। এটি খুব গুরুত্ব পূর্ণ একটি কথা যা আমাদের সবাইকে দৃষ্টিতে রাখতে হবে। এই লায়লাতুল ক্বদর যদি আমরা সফল ভাবে অতিক্রম করি তাহলে উন্নতি এবং অগ্রগতির সিদ্ধান্ত হবে অসাধারন। সিদ্ধান্ত তো আল্লাহ্ তা'লাই করবেকন দোয়াও আল্লাহ্ তা'লাই কবুল করবেন আর লায়লাতুল ক্বদরও আল্লাহ্ তা'লাই দেখাবেন। কিন্তু সেই কথাগুলো মেনে চলা আবশ্যক যা লায়লাতুল ক্বদর লাভের কারন হয়ে থাকে। এরপর যে প্রভাত উদিত হয় সে প্রভাতও অসাধারন প্রভাত হয়ে থাকে এবং অসাধারন সফলতা নিয়ে এই দিন আমাদের জীবনে আসবে। লায়লাতুল ক্বদর থেকে কল্যান লাভের জন্য এই কথাগুলো আমাদের সবসময় সামনে রাখতে হবে। লায়লাতুল ক্বদর কুরবানির সেই মুহূর্তের নাম যা খোদার দরবারে গৃহিত হয়। আর খোদার দরবারে যা গৃহীত হয় এর চেয়ে বেশী লাভজনক ব্যাবসা আর হতে পারেনা। তাই গ্রহণীয় ত্যাগ স্বীকার বা কুরবানী করা উচিত। ইসলামী যুদ্ধে উদাহরণস্বরূপ বদরের যুদ্ধে কাফেরও মারা গেছে আর মুসলমানরাও শহীদ হয়েছে। কাফেরদের নিহিত হওয়া কোন মতেই লায়লাতুল ক্বদর ছিলনা কিন্তু মুসলমানদের শহীদ হওয়া নি:সন্দেহে লায়লাতুল ক্বদর ছিল। কেননা আল্লাহ্ তা'লা এসকল কুরবানিকে গৃহিত আখ্যায়িত করেছেন। যে কষ্টের আল্লাহ্ তা'লা কোন মুল্য নির্ধারন করেননা তা লায়লাতুল ক্বদর নয়। তা হলো শাস্তি আযাব কিন্তু সেই কষ্ট যার জন্য খোদা মুল্য নির্ধারন করেন সেটি হলো লায়লাতুল ক্বদর। অর্থাৎ অন্ধকার বিপদাপদ দুঃখ সমস্যা যার পুরস্কার দেয়ার আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত করেছেন সেটিই হলো লায়লাতুল ক্বদর। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য এমন কিছু মুহূর্ত নির্ধারন করে রেখেছেন যে মুহূর্তে কৃত যেকোন কুরবানি আল্লাহ তালার দরবারে গৃহীত হয়। নিশ্চয় জামাতে কআহমদিয়া এর দৃষ্টান্ত দেখে থাকে এবং দেখেছে। কোনকোন দেশে আহমদীদের জন্য পরিস্থিতী অত্যন্ত কঠোর। যেখানে এই কঠোর পরিস্থীতি তাদের প্রভাত উদিত হওয়ার শুভ সংবাদ দিচ্ছে সেখানে এই লায়লাতুল কদরের ফলশ্রুতিতে পৃথীবির দেশে দেশে শহরে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে বহু আহমদি সন্তানের জন্ম হচ্ছে নতুন নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এটি হতে

অধিক কল্যান লাভের জন্য লায়লাতুল কদরের বর্ধিত কল্যানরাজি ঘরে উঠানোর জন্য আমাদের সবার এই অঙ্গিকার করা উচিত যে আমাদের সবার পারস্পরিক ঐক্য এবং একতা পুর্বের তুলনায় দৃঢ় হবে এতে যদি কোন বিপত্তি দেখা দেয় কোন ফাটল সৃষ্টি হয় তাৎক্ষনিক ভাবে তা দুর করবো ।রুহামাও বায়নাহুম পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং সহানুভুতির প্রতীক হিসেবে লায়লাতুল কদরের ভাগী হবো । এ রমযানে তাই আমাদেরকে পারস্পরিক এবং ব্যাক্তিগত পর্যায়ে মনোমালিন্য দূর করার চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা লায়লাতুল ক্বদর থেকে কল্যান লাভ করতে পারি । আর লায়লাতুল কদরের ফল ফসল সফলতা উন্নতি এবং পুরস্কার রাজি সমষ্টিগত ভাবে বা জামাতের দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নির্ধারিত তা থেকে যেন আমরা অংশ পেতে পারি ।আমাদের এটিও স্বরন রাখতে হবে যে খোদার কৃপাবারি যতই প্রবল রুপ ধারন করছে সেই অনুপাতে শত্রু আমাদের পথে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করবে এবং করছে ।পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করবে এবং করছে । এ কথা ভাবা উচিত নয় যে এসব শুধু কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ। হীংসার অগ্নী উন্নতির গতি থামিয়ে দেয়ার জন্য চুড়ান্ত চেষ্টা করে আর সর্বত্র এটি করবে। কিন্তু লায়লাতুল ক্বদর আসার শুভ সংবাদ এসবের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা এবং জামাতী উন্নতির নিমিত্তে কৃত দোয়া গৃহীত হওয়ারও শুভ সংবাদ দিচ্ছে।তাই যতদিন আমরা নিজেদের অবস্থাকে খোদার সন্তুষ্টির অধিনস্ত রাখার চেষ্টা করাবো লায়লাতুল ক্বদর থেকে আমরা অংশ পেতে থাকবো। মুমেনদের উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা এবং বাসনা জামাতকে উন্নতির সেই পরম মার্গে দেখার থেকে থাকে যার আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)এর প্রতি আরোপিত হয়ে আমাদের সেভাবেই সেই সকল উন্নতির অংশ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ) বলেছেন। আর সেই রীতি সেই দুটো কথার মাঝে এসে যায় যা তিনি নিজ আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন একটি হলো খোদার সাথে বান্দার সাক্ষাৎ বান্দার খোদার সাথে মিলিত হওয়া দিতীয়ত মানুষের অধিকার প্রদান। তো এই দুটো কাজ হলো আমাদের প্রধান দায়িত্ব একটি হলো ইবাদতের মান উন্নত করা আর পারস্পরিক মতভেদ এবং ঝগড়া বিবাদ ছেড়ে দিয়ে পারস্পরিক প্রাপ্য অধিকার প্রদানের দিকে মনোযোগ দেয়া। এটি হতেই পারেনা যে অধিকার প্রকৃত অর্থে আদায় হবে আর মনোমালিন্য ও ভেদাভেদও থেকে যাবে। এই নীতি যদি আমরা অনুসরন করি তাহলে লায়লাতুল কদরের প্রকৃত মর্ম আমরা বুঝতে পারবো এবং লায়লাতুল ক্বদর লাভ হবে আমাদের জীবনে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় লায়লাতুল ক্বদরকে এভাবে সঙ্গায়ীত করেছেন যে লায়লাতুল ক্বদর মানুষের জন্য তার সবচেয়ে পরিস্কার এবং স্বচ্ছ সময় হয়ে থাকে ।তাই নিজেদের জীবনকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করার জন্য এমন লায়লাতুল ক্বদর আমাদের সন্ধান করা উচিত। প্রকৃত লায়লাতুল ক্বদর হবে যখন আমরা নিজেদের জীবনকে পবিত্র করবো আর আমি যেভাবে বলেছি যে দ্বীতীয় কথা হলো জুমাতুল বিদা সম্পর্কে এই সংক্রান্ত বহু অদ্ভুত এবং অলিক ধ্যান-ধারনা মানুষের মাঝে প্রবেশ করেছে। আমাদের প্রতি খোদার অপার অনুগ্রতহ যে তিনি আমাদেরকে যুগ ইমামকে মানার তৌফিক দিয়েছেন এবং ভ্রান্ত সব ধ্যান-ধারনা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। এসব ধ্যানধারনা থেকে আহমদীদের মুক্ত থাকা উচিত নতুবা আহমদী হয়ে লাভ কী?

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের জীবন দাতা এবং পৃথিবীতে প্রেরণকারী হলেন আল্লাহ্ যিনি এ পৃথিবীতে প্রেরণকারী তিনি আমাদের জন্য জীবনের এক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেভাবে তিনি বলেছেন, সেই উদ্দেশ্য হলো, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লে ইয়া'বুদূন অর্থাৎ আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে। সুতরাং জন্মের উদ্দেশ্য যেখানে ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লেইয়া'বুদূন সুতরাং এটি কোন বিশেষ দিন বা বিশেষ কোন জুমার সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং সকল নামায এবং সকল জুমা আবশ্যক। নফল তো আছেই যা মানুষ নিজের অবস্থা ও সামর্থ্য অনুসারে খোদার অধিক নৈকট্য লাভের জন্য পড়েই থাকে। তাই প্রকৃত মোমেনের দায়িত্ব হবে খোদার নির্দেশকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে পালনের চেষ্টা করা। বিশেষ করে ইবাদত যা জীবনের মূল উদ্দেশ্য এদিকে অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

একইভাবে রমযানকে নিন, রমযান হেলায় কাটিয়ে দেয়ার জন্য আসে না রোযা আবশ্যক সারা পৃথিবীর মানুষ রোযা রাখছে আমরা তাদের সাথে রাখি। অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব ইবাদত এজন্য নয় যে, কোনভাবে কাটিয়ে দিব, পরিবেশ বলছে তাই ইবাদত কর এবং এগুলো থেকে মুক্তি লাভ কর বরং মোমেন সবসময় এগুলো জীবনের স্থায়ী অংশ হিসাবে ধারণের চেষ্টা করে। এক মোমেন একবারও যদি সত্যিকার নামায আন্তরিকতার সাথে পড়ার সুযোগ পায় তাহলে তার হৃদয় থেকে নামায বের হতে পারে না। অদ্ভুত স্বাদ সে পায় পরবর্তী নামায পড়তে তাকে অনুপ্রাণিত করে। নামায শেষ করার সময় সে সালাম করে এজন্য নয় যে, আসসালামু আলাইকুম আমরা যাচ্ছি বিদায় নিচ্ছি বরং আল্লাহ্র নির্দেশ হিসাবে সে সালাম করে নামাযের শেষে। অনুরূপভাবে মানুষের জীবন থেকে রমযানও বিদায় নিতে পারে না। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এখানে বেশ ভাল একটি কথা বলেছেন, আমাদের দেশ থেকে উর্দূ ভাষায় খুব ভাল একটা বাগধারা রয়েছে, অর্থাৎ রোযা রাখা রোযা রেখেছে এটি খুবই সুন্দর একটি বাগধারা। রোযা যখন

অতিবাহিত হয় রোযাকে বিদায় দেয়া হয় না বরং রোযাকে ধরে রাখা হয় হিফাজত করা হয় সংরক্ষণ করা হয়। আর এটি স্থায়ীভাবে খোদার কৃপার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী করে। হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যদি মোমেন কোন ভুল করে তার নেক কর্মসমূহ তার জন্য বর্ম হয়ে ঢাল হয়ে তাকে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করে। তাই সকল নেক কর্ম সম্পর্কে এই মনোবৃত্তি থাকা উচিত এটি যেন আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে না যায়। বরং আমার জীবনে যেন স্থায়ী হয়। মানুষ সেটি থেকেই কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে যা স্থায়ী হয় জীবনে। যা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কুরআনেও আছে ওয়াল বাকিয়াতুস সালেহাত এর মাধ্যমে বলা হয়েছে নেক কর্মই স্থায়ী হয়ে থাকে।
যেভাবে আমি খুতবার প্রথম দিকে বলেছি, শাহরু রমযান .... সেই বরকতময় দিন যে দিনে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি রমযান আখ্যায়িত করা হয়। কুরআন অবতরণ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেদিন কল্যাণময় হয় না। সেটি হতছাড়া দিন হয়ে থাকে। তাই মোমেনের জন্য আবশ্যক হবে এ দিনগুলোতে কুরআন পাঠ এবং শিখার প্রতি যে মনোযোগ ছিল সেটি যেন সারা বছর জীবনের অংশ হিসেবে বিরাজ করে। সারা বছর কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিন। সারা বছর এর শিক্ষা মেনে চলার চেষ্টা করুন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হবে যদি এটিকে আমরা জীবনের অংশ করে নেই। এটিকে নামিয়ে যদি হৃদয়ে সংরক্ষন করি। যেন জীবনের সকল মোড়ে আমরা এটি থেকে লাভবান হতে পারি। আমি যে দুটো কথার আজকে উল্লেখ করলাম আল্লাহ করুন এদিকে যেন আমাদের স্থায়ী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এর প্রকৃত তত্ত্ব এবং মর্ম যেন আমারা বুঝতে পারি। আমাদের লাইলাতুল ক্বদর আমাদেরকে যেন সফলতার চরম মার্গে নিয়ে যায়। এর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি যেন অর্জন হয় আর এই জুমাতুল বিদা রমযানের শেষ জুমা যাকে জুমা তুল বিদা বলা হয় এটি জুমাতুল বিদা তো বলা উচিত নয়। বরং রমযানের শেষ জুমা। এই জুমা রমযানের বরকতকে বিদায় দেয়ার জুমা যেন না হয়। যেন এটা আমাাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য যেন সদা বাস্তবায়িত হয় আমাদের মাঝে আমাদের জীবনে। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের অবস্থার কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। দোয়ায় বিশেষভাবে তাদেরকেও স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ তালা তাদের জন্য পরিস্থিতি সহজ করুন এবং এই সমস্যা থেকে তাদেরকে পরিত্রান দিন।

নামাযের পর আমি এক ভাইয়ের গায়েবে জানাযা পড়াবো। তিনি হলে কিরগিস্থানেরে জনাব নইম উল্লাহ খান সাহেব। যিনি ২০১৪ সালের ২১ শে জুলাই ৬১ বছর বয়সে রিদ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি মধ্য এশিয়ার কিরগিস্থানে জামাত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা প্রদানের এবং নায়েব ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। খলিফাতুল মসীহ রাবে রাহে. মানুষকে যখন সেখানে যাবার তাহরিক করেন তখন তিনি সেখানে যান ব্যবসাবানিজ্যের উদ্দেশ্যে কিন্তু তিনি ধর্মের কাজও অনেক করেছেন। জামাতি কাজে সদা অগ্রগামী থাকতেন। জামাতী বিষয়াদীকে ব্যক্তিগত কাজের উপর প্রাধান্য দিতেন। সেখানকার প্রতিকুল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জামাতের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। নামায, তাহায্যুদ এবং দোয়া অজস্র ধারায়, সাদকা খয়রাত এবং আবশ্যকীয় চাদা ও অন্যান্য আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী। গরিব-দু:খিদের দেখাশুনা করতেন। খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো। জামাতের যে সমস্ত মোবাল্লেগ সেখানে গিয়েছেন তারা যে সমস্যার সম্মূখীন হয়েছেন, তাদেরও তিনি দেখাশুনা করতেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবা করতেন। সকল মোবাল্লেগ যারা এ সমস্ত এলাকায় খেদমত করেছেন বা কাজ করছেন তারা সবাই বলেন যে, তিনি জামাতের জন্য অসাধারণ আত্মাভিমান রাখতেন হৃদয়ে। জামাতে আহমদীয়া কিরগিস্থানের মিশন হাউজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা তারই ছিল। তিনি মূসী ছিলেন। দুই জন স্ত্রী, একজন পাকিস্তানী আর এক জন রাশিয়ান। তিনি দুই মেয়ে এবং চার ছেলে রেখে গেছেন। দুই ছেলে তার রাশিয়ান স্ত্রীর ঔরশজাত। রাশিয়ান স্ত্রী কিরগিস্তানের অধিবাসী। কিরগিস্তান থেকে তিনি চিঠি লিখেছেন। তিনিও তার আদর্শের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'লা তার প্রতি মাগফেরাত করুন। এবং স্বীয় করুনার চাদরে আবৃত করুন। তার স্ত্রী এবং সন্তানদের হামী ও নাসের হউন। জামাতের খেলাফতের সাথে তাদের সবসময় সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট রাখুন। তিনি যে সমস্ত নেককর্ম ও পুণ্য কর্মের সূচনা করেছেন সে সব নেক কর্ম তাদেরকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।